Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা-ভাবনা

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.8
Pages	১৩৯-১৫০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা-ভাবনা

মুনিরা সুলতানা*

শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা-বিষয়ক প্রত্ন-জিজ্ঞাসা ও তার নানামাত্রিক অনুসন্ধান থেকে শিল্পীর নিজস্ব বা তার অনুসৃত নন্দনতত্ত্বের জন্ম। আর সাহিত্যের সহৃদয় বিচারক বলে নিজেকে স্বীকৃতি দিয়ে যারা আনন্দিত হন, নানা পন্থার বৈচিত্র্যের মাঝে সাহিত্যের, সাহিত্যের উদ্দেশ্যের, উপযোগিতার একটা চিরন্তন অথবা আন্তরিক সংজ্ঞার্থ দিতে ব্রতী হন তারা। এ মীমাংসা সহজ নয় বলেই সাহিত্য-বিচারেরও গোত্রভেদ বেড়েছে। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) সাহিত্য বিচারে স্পষ্টত কোনো পদ্ধতি বা আরোপিত পন্থায় বিশ্বাস ও তা অবলম্বন করেছিলেন — একথা বলা যায় না। তবে সাহিত্য-সমালোচনার রীতি বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল। তাঁর সাহিত্যচিন্তার বিশেষ দিকগুলো থেকে সমালোচনার মতাদর্শ অনেকটা শনাক্ত করা যায়।

যে অনিবার্য মূলীভূত প্রেরণার বলে মানুষ যুগ-যুগান্তরে 'কল্পনারচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে বিরতিহীন, অক্লান্তভাবে'; তার গুরুত্ব বুদ্ধদেবের কাছে বেশি, কেননা 'মানবজাতির আবহমান জীবনে শিল্পকলার মৌলিক প্রয়োজন' (বুদ্ধদেব, ১৯৭৪ : ৩৬) আছে একথা বিশ্বাস করেন তিনি। একজন কবি হিসেবে তিনিও কখনও কখনও সৃষ্টির নেপথ্য তাগিদ অনুভব করেছেন :

> রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে কবিতা আমরা লিখি না, কোনো-কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র।[১]

কিন্তু প্রেরণা মানলেও শিল্পীর অন্তর্গামিতা, মনন-চৈতন্যের সহযোগ তথা অনুশীলন বুদ্ধদেবের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, 'শিল্পীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে আবিষ্কার করা, এজন্য শিল্পীকে নিজের মধ্যে স্তব্ধ হ'তে হয়, অতিশয় শান্ত হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে হয়।' (বুদ্ধদেব, ২০০৯ : ১৪৪) আর আত্ম-আবিষ্কারের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি 'জীবন ভরেই চলা উচিত' বলে তিনি মনে করেন; এটি শিল্পীর কর্মের বাধ্যতাও, যা তাঁকে 'মুক্তি এনে দেয়'। শিল্পের উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য নিয়েও কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনোরকম শিল্প সাধনায় বিশ্বাসী নন তিনি। আর্টিস্ট বা শিল্পীর দিক থেকে শিল্পরচনার সত্য হল স্রষ্টার নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার। 'উত্তরা'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর (১৯০০-১৯৭৩) সঙ্গে পত্র আলোচনায় (১৯৩৩) এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

> আপনি যদি জানতে চান Art for Art's sake-এর বদলে অন্য কোনো কথা বসানো যায় কিনা, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি। ধরুন, লরেন্সের কথাটাকে একবার চেষ্টা করে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> দেখা যাক — Art for my sake , Art for *my* sake আর্টিস্‌টের দিক থেকে এতো বড় সত্য আর-কিছু নয়। আমার জন্য আর্ট — এই একমাত্র কথা, যার প্রতিবাদ করা যায় না, যাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, কোনোরকম চাঁছাছোলা করবার দরকার হয় না। আমার জন্য আর্ট — এখানে কোনো তর্কের ক্ষেত্র নেইঃ প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিস্‌টের এটা গূঢ়তম মনের কথা। (বুদ্ধদেব, ২০০৫ : ৪০১)

তবে শিল্পীর পক্ষ থেকে তাঁর নিজের জন্যই শিল্প কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখার উপায় নেই। অর্থাৎ তা কেবলই স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টির আনন্দবাদিতা বোঝায় না। এর মাঝে রয়েছে 'প্রকাশতত্ত্ব', যা অনেকটা রবীন্দ্র-নন্দনচিন্তার অনুগামী। 'আত্মপ্রকাশের অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা', 'আত্মপ্রকাশের দুঃসহ যন্ত্রণা', সর্বোপরি ক্রমাগত 'হয়ে ওঠবার' অনির্বচনীয় আনন্দটাই বুদ্ধদেবের প্রকাশতত্ত্বের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন :

> আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৪৫৯)

এই একই বক্তব্য ভিন্ন ভাষায় বলেন বুদ্ধদেবও :

> আমি যতক্ষণ লিখি একমাত্র নিজেরই জন্য লিখি... অনির্বচনীয় আনন্দের জন্য। তাছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই। পৃথিবীর ভালো-মন্দ অন্যকিছুর জন্য আমার ভাবনা নেই। তখনকার মতো আর-কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই আমার পক্ষে; নিজেকে প্রকাশ করবার সেই অসহ্য তাগিদ ছাড়া। (বুদ্ধদেব, ২০০৫ : ৪০১)

শিল্পের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ সাংসারিক কিংবা সামাজিক হতে পারে কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, 'শিল্পীকুলে নমস্য তাঁরাই যাঁরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করলেও সেটাকে বিপুলভাবে অতিক্রম ক'রে যান।' (বুদ্ধদেব, ১৯৭৪ : ৩৬)। তাছাড়া শিল্পী কিংবা পাঠকের 'মনের মধ্যে যা এক নতুন জীবন দান করে, সেটা নিশ্চেষ্ট কোনো সম্ভোগ নয়, একটি অভিজ্ঞতা; নিছক সুখবোধ নয়, আবিষ্কার ... তাহ'লে কেমন ক'রে বলা যায় শিল্পকলা আলস্যজীবীর বিলাসিতা বা উচ্চাঙ্গের কোনো আমোদ-প্রমোদ?' (বুদ্ধদেব, ১৯৭৪ : ৩৬)। আবার 'কিসের জন্য আর্ট'-এ (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা পত্র, ১৯৩৩) বুদ্ধদেব অস্কার ওয়াইল্ড ও বানার্ড শ'র উক্তি যথাক্রমে, 'Art is entirely useless' এবং 'All art is bound to be didactic'-এর উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর কাছে উভয়ই সমান সত্য। যদিও এ প্রসঙ্গে আত্মবিরোধের প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছে। 'আধুনিক' সাহিত্যে বাস্তবতা, ভাল-মন্দ, সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে নানা ভাবনা ও মত বুদ্ধদেব বিভিন্ন প্রবন্ধে, পত্রে প্রকাশ করেছেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র ('আর্টে রিয়ালিজম', ১৯৩৩), 'কবিতা'-সম্পাদকীয় (১৩৫৪), 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য (১৯৫২), 'চাই-আনন্দের সাহিত্য' (১৯৫১), *কবিতার শত্রু ও মিত্র* (১৯৭১) প্রভৃতি রচনা। 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' প্রবন্ধে ইয়েট্‌স, রিলকে ও ভালেরি — আধুনিক এই তিন কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আধুনিকতা ও সাময়িকতা বিষয়ে লিখেছেন। বুদ্ধদেব মনে করেন, কেবল সমকালীন ঘটনার বর্ণনাই আধুনিকতার একমাত্র সংজ্ঞার্থ নয় । ভারত-স্বাধীনতার পরে লিখিত এ প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেছেন যে চলতি মুহূর্তের ক্ষণিক আবেগ লিপিবদ্ধ

করার কর্তব্যপরায়ণতা থেকে এখন মুক্তির সময় এসেছে; 'কিন্তু আত্মজীবনের বদলে যাঁরা আজ সমাজ-জীবনের তথ্যানুগামী, ঘটনা-প্রসূত উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা যা লিখছেন, তা অনেক সময় হ'য়ে উঠেছে — শুধু সাহিত্য নিয়ে পরিহাস নয়, মানুষের দুঃখকেও অপমান। বিষয় হিশেবে গণজীবনকে অবলম্বন ক'রেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ ... দুঃখটা কখনো কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি ক'রে বলা যে আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অ-সাহিত্যের উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান', কিংবা এমনও মনে হয় এ যেন বাংলা সাহিত্যের একদা-খ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র শোকোচ্ছ্বাসের আধুনিক প্রকরণ।' (বুদ্ধদেব, ২০০৯ : ১৩৯-১৪০)। বুদ্ধদেবের এ বক্তব্যে খানিকটা রাবীন্দ্রিক সুর আছে। কল্লোলযুগের 'আধুনিক' সাহিত্যের কিছু নিদর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথও ভাবিত ছিলেন, 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (১৩৩৪) প্রভৃতি প্রবন্ধে।

বুদ্ধদেব বসুর ভাবমূর্তি আধুনিকবাদী নন্দন ভাবনার স্থপতি হিসেবেই বেশি উজ্জ্বল। নবদীক্ষিত আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতা তাঁর নিজের যেমন ছিল, তেমনি সমকালে এ আন্দোলনকে সমর্থন ও স্বীকৃতি তিনি জোরালোভাবেই দিয়েছেন। 'আধুনিকবাদী' শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ পূর্বাপর একইরকম থাকেনি। সাহিত্যে শ্রী, পরিমিতির অভাব অপরিপক্ব আতিশয্য ও আরো নানা দুর্বলতাকে রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও সমর্থন করতে পারেননি। এ দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'চাই– আনন্দের সাহিত্য' (১৯৫১)। এতে তিনি লিখেছেন :

> কোনো-এক অর্থে এই বিশিষ্টরকম আধুনিক সাহিত্য তার কল্পিত মানুষের মতোই ফাঁপা, তাতে চিত্রিত বন্ধ্যা জমির মতোই নির্বীজ, তাতে বর্ণিত জীবনের মতোই হতাশাচ্ছন্ন। অর্থাৎ এই সাহিত্যের তাৎপর্য নঞর্থক, এর বাণী বলতে প্রকাণ্ড একটা 'না' ভিন্ন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায়না — শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিতৃষ্ণা, মানুষের মূঢ়তার 'Savage indignation' নয়, মানুষের পতন-প্রবণতার এক ফোঁটা করুণাও নয় — শুধু প্রত্যাখ্যান, তিক্ততা, নয়তো বাঁকা ঠোঁটে দুর্বলের ব্যঙ্গ, আর নয়তো কোনো অন্ধ বিশ্বাসের পায়ে নিশ্চিন্ত, অসহায় আত্মসমর্পণ। আধুনিক জীবনের ব্যর্থতার ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ব্যর্থতারই মৌতাতে মেতে উঠলেন লেখকেরা — সেটাকেই ঘিরে ঘিরে ঘুরছেন, ঘুরতেই ভালো লাগছে, যাঁর বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান, সেটাই যেন গ্রাস করে রেখেছে তাঁদের। কিছুতেই বেরোতে পারছেন না সেই আবর্ত থেকে, নিজের 'উদগীর্ণ জালে নিজেরাই আটকে আছেন মাকড়সার মতো।' (বুদ্ধদেব : 'চাই — আনন্দের সাহিত্য'; উদ্ধৃত : তপোধীর, ২০১০ : ২৫)

এ প্রবন্ধেই তিনি আরো জানাচ্ছেন যে জীবনে boredom ও horror নিশ্চয়ই আছে এবং এটা অপূর্ণ কোনো আবিষ্কারও নয় কিন্তু এই 'boredom'-এর কবিদের রচনা পড়তে পড়তে "এ সন্দেহ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারি না যে তাঁরা নিজেরাই সীমাহীনরূপে ক্লান্ত।" (উদ্ধৃত : তপোধীর, ২০১০ : ২৬) নৈরাশ্য-হতাশার বিপরীতে ইতিবাচক জীবনার্থ প্রকাশের দায় স্বীকার করে বুদ্ধদেব বলেন, বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে সাহিত্যের গতি হবে 'সরলতার, স্বীকৃতির ও সদর্থক অঙ্গীকারের দিকে', পরপরই আবার বলেন, অন্তত 'তা কোনো কাল্পনিক স্বর্গলাভের আশায় রাষ্ট্র কিংবা মন্দিরের যুগে আত্মবলির পরামর্শ দেবে না,

মানুষের কানে হয়তো বা সবচেয়ে দুঃসাহসী কথাটি উচ্চারণ করবে, বাঁচো ভালবাসো, হও। ১৯৫১ সালে বুদ্ধদেবের এই বক্তব্য একেবারে আকস্মিক নয়, ১৯৪৭-এর এক 'কবিতা'-সম্পাদকীয়তে (চৈত্র ১৩৫৪) তিনি একই রকম ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন যে, সাহিত্য অব্যতীতরূপে ভালোকে লক্ষ করে, সুখ-দুঃখ-ব্যঙ্গ-বিষণ্নতা, যে কোনো উপায়েই হোক, সাহিত্য চিত্তশুদ্ধিরই জনক, চিত্তশুদ্ধির গভীরতার অনুপাতেই সাহিত্যের স্তরভেদ। 'আর যেখানে চিত্তশুদ্ধি একেবারেই নেই, পক্ষান্তরে যা বিষাক্ততার বীজাণু-ভাণ্ডার, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের শিল্পলোক অতিক্রম করে চলে এসেছি কোনো দল-পাকানো চক্রান্তে, কোনো সেপাই-বানানো আপিশে, কিংবা একেবারে রণক্ষেত্রে।' (বুদ্ধদেব, ২০১০ : ৭৩) সাহিত্যের কাছে বুদ্ধদেবের দাবি এই যে, তা উপলব্ধি করাবে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ঐক্য, বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র, খণ্ডীকৃত, আত্ম-সীমান্ত জীবনের ঐক্য, মানবিক বিশ্বের সঙ্গে, আবার প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গেও; আর এ-দাবি সাহিত্য মেটাতে পারে না, 'যদি-না তার নিজের মধ্যেই থাকে বিশ্বব্যাপ্তির অসীমতা, কালাতিক্রমী অমৃত।' (বুদ্ধদেব, ২০১০ : ৭৪)। জীবনের গভীর অথচ সহজ সুন্দর অভিব্যক্তিই সাহিত্যের — এ মত প্রকাশ করে বুদ্ধদেব বলেন, 'বিষয় যা-ই হোক, উপায় যা-ই হোক, মানুষের কাছে সাহিত্যের শেষ কথা এই; 'ভালো হও, ভালোবাসো'। (বুদ্ধদেব, ২০১০ : ৭৪) বুদ্ধদেব এভাবেই প্রতীচ্যের আধুনিকতাবাদী শিল্প-ভাবনার রুগ্নতা ও তার ক্রমবর্ধমান সংক্রাম এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। তাঁর নিজস্ব আধুনিকতার ধারণার সাথে তাঁর সহযাত্রী-অনুগামীদের অমিলও এভাবেই রচিত হয়েছে। এ যেন তাঁর 'আত্মতা ও অহংনির্ভর এক কলাকৈবল্যবাদ যা কোনো পরিসর পায় নি বাংলা আধুনিক কবিতায়।' (খোন্দকার, ২০০৮ : ১২১)

খ.

সাহিত্য সমালোচনার গুরুত্ব নিয়ে সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই অর্থাৎ 'প্রগতি' পর্ব (১৩৩৪) থেকেই বুদ্ধদেব ভাবিত ছিলেন। 'প্রগতি'র প্রথম বছরের (আষাঢ় ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) এগারো মাসের সংখ্যাতেই 'মাসিকী' শীর্ষক সমালোচনাবিভাগ উপস্থিত। (সমীর, ২০০৮ : ২৩-৫৬)। এ পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার 'মাসিকী' থেকে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা ভাবনা লক্ষণীয়। সদ্য গড়ে ওঠা বিশিষ্ট তরুণ সাহিত্য সম্পর্কে যুগধর্মে অবিশ্বাসী নিন্দুকদের সাহিত্যসমালোচনার অধিকার নিয়ে আস্থাবান নন তিনি। তরুণ সাহিত্যের যে একটা যথার্থ অস্তিত্ব আছে, তার ভঙ্গি বিভিন্ন, তার সুর নতুন, তার আদর্শ স্বতন্ত্র এবং তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করতে না পারলেও তার মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন বর্তমান একথার সাথে সাথে তিনি গুরুত্বের সাথে একথাও জানিয়ে দেন যে আধুনিক সাহিত্যের বিচারে এর আড়ালে থাকা নবজাগরণের অনুভূতি বা নতুন সাহিত্যিক যুগোন্মেষের আভাস গণনা করা প্রয়োজন। যেকোনো সাহিত্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্য যে উপেক্ষণীয় নয়, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন; তিনি যখন লেখেন, 'কোনো কাঁচা লেখাও কোনো বিশেষ মুহূর্তে সবীজ হতে পারে, খুব উঁচু করে নতুনের নিশেন উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো' (বুদ্ধদেব, ২০০৫ : ৮০) — তখন বোঝা যায় নতুন মানেই তিনি তাকে স্বয়ম্ভু

ভাবেননি, কালান্তরে তার প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন কিংবা প্রকৃতিগত ভাবান্তর ঘটতে পারে; আর তা স্বীকার করে নেওয়াই নতুনকে সবীজ করে তোলা ও বিচারক মনের সজীবতার লক্ষণ। 'প্রগতির' ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় সমকালীন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অপরিপক্বতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বুদ্ধদেব। সমকালীন সাহিত্যিক পরিবেশে কিংবা কোনো কোনো শিল্পকর্ম নিয়ে সমালোচকের মনের বদ্ধমূল সংস্কারের ভিত্তিতে হওয়া সাহিত্যিক বাদানুবাদ লক্ষ করে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার পরিবেশ বাংলা সাহিত্যে থাকা প্রয়োজন :

> আমরা প্রায়ই মুখের কথায় বলি, 'বইখানা বেশ লাগল' — কিন্তু কেন যে বেশ লাগল, কোথায় যে তার 'বেশ'-ত্ব, এ-কথা জিজ্ঞেস করলে আমরা অনেকেই হয়-তো কোনো উত্তর দিতে পারব না। সেই 'কেন'র উত্তর দিতে পারাই যথার্থ সমালোচকের লক্ষণ। উঁচুদরের সমালোচকের পক্ষে নিছক রস-বোধই যথেষ্ট নয়, তাঁর কাজ অনেকটা বৈজ্ঞানিকের কাজের মত। বিশ্লেষণের অনুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে তাঁকে খুঁটিয়ে-নাটিয়ে সবকিছু বার করতে হবে — কোন্ কোন্ চিন্তার বীজানু তার মধ্যে প্রচুর, কোন্ কোন্ প্রভাবের হাওয়া লেখকের মনে দোলা দিয়েছে — তারপর সব মিলিয়ে একটা বিরাট, সর্বব্যাপী উপলব্ধি এবং ভাষায় তার যথাযোগ্য প্রকাশ — এই হল গিয়ে সমালোচনা। (বুদ্ধদেব, 'প্রগতি', সম্পাদকীয়, ভাদ্র ১৩৩৪, উদ্ধৃত, শান্তনু, ২০০৮ : ২০৫-২০৬)

বক্তব্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা থাকলেও বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে তথা কালের নিরিখে বুদ্ধদেবীয় এই মতাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলা সমালোচনার গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সমালোচনার গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যেরাও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন, তবু বিশ শতকে অন্তত মধ্য পর্ব পর্যন্ত নানা ভ্রান্তি, অস্পষ্টতা, গতানুগতিকতা, অপূর্ণতা ছিল। সমালোচনা সাহিত্যের আবশ্যকতা নিয়ে 'প্রগতি'র ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যাতেই তাঁর আরো মূল্যবান বক্তব্য হল :

> আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য সব দিকেই একটি নতুন ভাবের উদ্দীপনা দিয়ে গড়ে উঠছে — এ কথা যার চোখ কান আছে, সে-ই মানতে বাধ্য হবে। তাই একটি সুন্দর, সুষ্ঠু সমালোচনা-সাহিত্য গঠনের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের মত সমালোচনাও যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর্ট এবং তা আয়ত্ত করতে হলেও যে প্রচুর বিদ্যাবত্তার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ মনীষা ও সংযম দরকার, এ কথা আজকাল যে অল্প ক'জন উপলব্ধি করেছেন, আশা করি তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী সমালোচনা সাহিত্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন। (বুদ্ধদেব, 'প্রগতি' সম্পাদকীয়, ভাদ্র ১৩৩৪, উদ্ধৃত, শান্তনু, ২০০৮ : ২০৯)

'শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য পাঠকের চোখে ধরিয়ে দেয়া বা পাঠককে এর রস-আস্বাদনে সাহায্য করার নামই সমালোচনা' (উদ্ধৃত, শান্তনু, ২০০৮ : ২৩০) — 'প্রগতি' পর্বে সমালোচক স্বভাব বা তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত এমন বক্তব্যই দিয়েছেন বুদ্ধদেব। তবে সাথে এও বলেছেন যে, কোনো রচনা 'কত ভালো' তা লিখলেই নিস্তার নেই; কেন ভালো, তা-ও বলতে হবে ... (কারণ) 'সমালোচনা তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, নিরপেক্ষ বিবেচনা শক্তি এবং সুস্থ ও উদার রুচির ফল। ... রুচির উদারতা ও সর্বত্র গুণ গ্রহণ ক্ষমতা না থাকলে উঁচুদরের

সমালোচক হওয়া যায় না।' (বুদ্ধদেব, 'প্রগতি' সম্পাদকীয়, ১৩৩৬, উদ্ধৃত, শান্তনু, ২০০৮ : ২৩১)। সাহিত্যে রস ব্যাপারটা বিমূর্ত ধরে নিয়ে সমালোচক বিচারকে সাহিত্য করে তুলবেন অর্থাৎ বিষয়টিকে উপলক্ষ করে রসপ্রমাতা হিসেবে অবিরাম আত্মপ্রকাশ করে যাবেন না-কি ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক যুক্তিপন্থাও অবলম্বন করবেন — সেটা সমালোচনাতত্ত্বের ইতিহাসে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিদ্যমান। স্মর্তব্য যে, 'প্রগতি'র পরেও বুদ্ধদেব বসুর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও সমালোচনা ভাবনা কিংবা সমালোচক সত্তা নানা বিষয়কে আধার করে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। 'প্রগতি' পর্বের পরে কেবল কবিতা অর্থাৎ একটি শিল্পমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট করে তোলার গরজে সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা সমকালে নব্য সাহিত্যিকদের এগিয়ে নিয়েছে। এই পত্রিকার পৌষ ১৩৪২ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'প্রগতি' ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের মতাদর্শের অনুরণন পাওয়া যায়, সমালোচক হিসেবে তাঁর অনেকান্তিক প্রচেষ্টা ও বৃহৎ পরিধির বিবর্ধন সত্ত্বেও তিনি নিজে বিচার বলতে কী বোঝেন, তা স্পষ্ট করে বলে দেন :

> এখনো আমি সাহিত্য বিচার করি আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকি জীবন তাই করবো। (বুদ্ধদেব, 'কবিতা' সম্পাদকীয়, পৌষ ১৩৪২, উদ্ধৃত, সুদীপ, ১৯৯৭ : ২১২)

১৯৪৫-এ 'কালের পুতুল' প্রবন্ধে (*কালের পুতুল*) সমালোচনা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সমালোচনার নিরপেক্ষতা-পক্ষপাত, লেখকের প্রশংসা নিন্দা, সমালোচনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, সমালোচ্য বিষয়ে প্রকাশিত মতের স্থিরত্ব, সমালোচনাকে সাহিত্য করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে এ প্রবন্ধে লিখেছেন তিনি। প্রথমত, সমালোচনা বিজ্ঞান না শিল্প এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সমালোচনা 'আধুনিক' যুগ-পর্বে পূর্বাপর থেকে গেছে। বুদ্ধদেব বসু দু'য়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিষয়ে বলেন, 'যাকে exact science বলে সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত, এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটির কথা।' 'কবিতা কী, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না — কিন্তু অনেকগুলি উত্তর পাশাপাশি সাজালে হয়তো সবগুলিতেই সত্যের আভাস পাওয়া যাবে। সত্যের আভাস এখানে যথেষ্ট, দুটি বিপরীত কথা একই সঙ্গে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমাদের বাধে না। বিজ্ঞানের জগতে যা অসম্ভব। (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৪০)। অর্থাৎ যুক্তির স্থিরত্ব, নির্দ্বান্দ্বিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি হল বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেবের মতে, সাহিত্য কিংবা এর পাঠ এক ধরনের চলিষ্ণু প্রক্রিয়া, যেখানে আবেগের কম্পন আছে, বিরোধিতা আপেক্ষিকতা ইত্যাদি আছে। সুতরাং বিচার কিংবা সমালোচনায় ব্যক্ত হওয়া মতের ভঙ্গুরতা, চঞ্চলতা অর্থাৎ বৈচিত্র্য থাকতে পারে, একই সমালোচ্য বস্তুর প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত কালের বিবর্তনে প্রত্যাখাত হতে পারে। বিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট নীতি-রীতির প্রবর্তন করে সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনা ভুল বলে বুদ্ধদেব মনে করেন। সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিকতা বা নিন্দা পক্ষপাত বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। সমালোচক কোনো সৃষ্টিকে মন্দ বললে তা সব সময়ই সত্য এবং তার ইতিবাচক বিচার ভ্রান্ত — তা তিনি মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে সমালোচনার এক ধরনের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন তিনি :

> সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উন্মীলন, সাহিত্যের বড়ো একটা পটভূমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত ক'রে এবং নিজের উৎসুক চিত্তকে প্রকাশ করে পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক। এ কাজে উত্তাপ চাই, উৎসাহ চাই, নিন্দার ঠাণ্ডা সংকীর্ণতা দিয়ে তা সাধিত হতে পারে না। (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৪১)

এই সূত্রেই বুদ্ধদেব অনুভব করেন মতামতের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলার তাগিদ। বিচারকে রসাত্মক এবং সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ করতে পারলে 'সুবিধা এই যে, পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি নাও হয়, সাহিত্য রসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে। ... সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব সমালোচনা অমর হয়েছে তাতে যে সব সময়েই একেবারে নির্ভুল মতামত ছিল তা নয়, ছিল সেই পরিমাণে রচনার সুষ্ঠুতা যাতে তারা সাহিত্যের গৌরব বলে স্বীকৃত হতে পেরেছে। যেহেতু সমালোচনা ভাষায় লেখা হয়, পরিভাষায় নয়, অতএব সমালোচকের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভাষাশিল্পী হওয়া।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৩৮)। সমালোচকের এই ভাষাশিল্পী হবার প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধদেবের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সমালোচক হিসেবে তিনি নিজে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর আরো ধারণা :

> সমালোচনার আর একটা দিক আছে সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূল সূত্র উদঘাটন করা, এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ কাজ যাঁরাই করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে স্বীকৃত। (বুদ্ধদেব, 'কবিতা' সম্পাদকীয়, আষাঢ় ১৩৫০, উদ্ধৃত, অরুণকুমার, ২০০২ : ১০৩)

এছাড়া বুদ্ধদেবের মতে, সমালোচনা ভালো মন্দ বাছাই করতেও শেখায় আর 'সে শিক্ষা যত বেশী লোক যত ভালো করে নিতে পারবে, ততই সাহিত্যে মন্দ কমে গিয়ে ভালোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। সমালোচনার একটি সুদৃঢ় উজ্জ্বল আদর্শ পরিণত সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৩৭)। আর মতভেদ, তর্ক কিংবা পরিবর্তনের বিক্ষেপ সত্ত্বেও 'মানুষের মনে মিলনের' যে ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিজেকে প্রয়োগ করে, তার পটভূমিকা চিরন্তন, বুদ্ধদেবের মতে, সে কারণেই সে সার্থক ও শ্রদ্ধেয়। বুদ্ধদেবের সাহিত্য-চিন্তার যে অংশটি তাঁর সমালোচনা ভাবনার নিয়ন্তা, সে মতাদর্শের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা ভাবনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 'সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৫২০) তোলার পক্ষপাতী। সাহিত্য থেকে গভীরতম আনন্দ শোষণ করে তা স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা সৎ ও আন্তরিক সমালোচকের কাজ — একথাই বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন। অনুশীলনলব্ধ বা বিধিসম্মত সমালোচনার প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তাঁর কাছে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় তিনি ভেবেছেন সমালোচকের রসসাহিত্যিক সত্তাকে। সমালোচনা তাই তাঁর কাছে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত।

গ.

আধুনিককালে সাহিত্যসৃষ্টিতে জীবন-সমালোচনার প্রাধান্যকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮)। সাহিত্যকে 'Criticism of life' (*Essays on Criticism*) বলে

সমালোচনার গতিধারাকে বদলে দিয়েছিলেন তিনি। 'সর্বোত্তমকে জানার এবং জানানোর নিরপেক্ষ উদ্যোগই সমালোচনা' বলে রায় দিয়েছেন ম্যাথু আর্নল্ড। বিচারকর্ম হিসেবে সমালোচনার ধারা বিকশিত হতে থাকলে সৃষ্টিকর্মের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি মূল্যায়ন নির্ণয় করাই হয়ে উঠল এর প্রাথমিক কাজ। সৃষ্টিকর্মের এই ব্যাখ্যান ও বিচারের মাধ্যমেই আবার স্রষ্টা-শিল্পীর সাথে রসিক-পাঠকের সংযোগ স্থাপিত হয়। একুশ শতকের অনেকটা সময় পর্যন্ত সমালোচনার পন্থার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ ধারণা অটুট ছিল যে, সৃষ্টি ও তার পাঠকের মধ্যে ভাব বিনিময়ে সহায়তা করাই সমালোচকের দায়। এ কাজে অবশ্য সমালোচকের কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধের চেয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে তার নান্দনিকতার বোধ। তখন নিজস্ব রসবোধ, অনুভব-প্রবণতার বাড়াবাড়ি থেকে গৌণ হয়ে পড়ে বিষয় ও বিষয়ী। আধুনিক ও আধুনিকোত্তর সমালোচনা অবশ্য ক্রমাগত সূক্ষ্মতর, ঘনিষ্ঠতর, নিবিড়তর, অন্তরঙ্গতর হয়ে উঠেছে। সমকালীন সমালোচনার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী, ব্যাখ্যানধর্মী এবং মূল্যায়নধর্মী; প্রক্রিয়া হচ্ছে স্বাধীন, সার্বভৌম ও বহুমুখী। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি; সেইসাথে সমালোচ্য বস্তুকে কেন্দ্র করে আর্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহুত্ববাদী সমালোচনা বিকশিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতন্ত্রবাদ, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতন্ত্র এর কোন্‌টি যে সাহিত্যবিচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নিয়ে উনিশ ও বিশ-একুশ শতক ধরে মতবৈষম্য চলেছে। নানা ভাববস্তু, কল্পবস্তু, সাহিত্যবস্তু এবং আধার আধেয়ের আন্তঃসম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে সমালোচনাকর্মের এক একটি ফর্ম। যেগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন দিক নিদের্শনা দিচ্ছে: মনোবিশ্লেষণী/জৈবনিক দিচ্ছে লেখককে গুরুত্ব; ঐতিহাসিক/সমাজবিদ্যক গুরুত্ব দিচ্ছে কনটেক্সটকে; নিও-হিস্টরিসিজম টেক্সট বহির্ভূত সত্যকে; নব্য সমালোচনা টেক্সটকে, উত্তরাধুনিকবাদীরা বয়ানের অবয়বকে; নির্মিত ভাবনার নিরন্তর বিনির্মাণ প্রয়াসকে অনুসন্ধান করছে। এভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-আধুনিক, উত্তর-কাঠামোবাদী সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনার নিরিখে বিনির্মিত হচ্ছে পুরনো ভাবনা। লেখকনির্ভর সমালোচনা তত্ত্ব ধীরে ধীরে উত্তর-আধুনিক সাহিত্য পাঠে এসে পাঠককেন্দ্রিক ভাবনায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 'চূড়ান্ত বা শাশ্বত বলে কিছু নেই' — তাই সাহিত্য বিচারে আপাত সত্যের অন্বেষাই সমকালীন সমালোচনার ঈপ্সিত।

সূচনাকাল থেকে বাংলা সমালোচনা কখনও সমাজ-ইতিহাসবাদী, রাজনীতিক পর্যবেক্ষণ, কখনও আনন্দবাদিতা, রস আস্বাদন তথা সৃষ্টিকে পাঠকের চিত্তে ধরিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে, কখনও রূপশৈলী বিচার করে এগিয়েছে। যুক্তিনিষ্ঠা, মননশীলতার গুরুত্বের পাশাপাশি স্বাধীন সৃজনশীলতার ভঙ্গিও ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-মোহিতলাল-আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বাংলা সমালোচনাকে সাংস্কৃতিক মানে সমৃদ্ধ করেছেন। সমালোচনায় নির্দিষ্ট তত্ত্বায়নও ছিল কম বেশি; সমালোচকেরা বিচার বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে সাহিত্য আলোচনার একটা পরাদর্শ বা 'standard' নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন কখনও কখনও। ভাষাভঙ্গি, নান্দনিক মতাদর্শ দু'য়ের সমন্বয়েই বিচারের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

সমালোচনা-বিষয়ক বুদ্ধদেবীয় মতামত তাঁর সমালোচনার ধরন ও একালে তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ে একমাত্র উপাত্ত নয়। তাঁর সমালোচনাকর্মের বিপুল আকৃতি ও প্রকৃতি এ

ব্যাপারে যৌক্তিক বিশ্লেষণের দাবিদার। তাঁর মতাদর্শ বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে একেবারে অভিনব নয়, তবে এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভঙ্গির বলে মনে হয়। স্রষ্টার মতো সৃজনক্ষমতা, পাঠক বা ভোক্তার মতো আস্বাদনে সক্ষম মন — এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি করেছে তাঁর সমালোচক সত্তাকে। ঔদার্য, সততা, নিষ্ঠা, ইতিবাচকতা, সংবেদনশীলতা, সৃষ্টির প্রতি গভীর আবেগ ও দরদ — এ সবই তাঁর সমালোচনার গুণ হিসেবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। সমালোচনার তিনি প্রবক্তা বটে; কিন্তু তাঁর বিচাররীতি সাধারণভাবে কোনো সমালোচনাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় — মার্কসীয় বীক্ষা কিংবা জ্যাঁ দেরিদা, রলাঁ বার্ত-এর বিনির্মাণবাদ, কাঠামোবাদে তাঁকে জরিপ করা কঠিন। সমালোচক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যই এখানে যে তাঁর নিজস্ব কোনো মতবাদ বা অনুসৃত তত্ত্ব নেই; রচনাটিকে নতুন আবিষ্কার হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তাঁর সুবিস্ত ত সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে ও একজন একান্ত সহৃদয় পাঠক হিসেবে তিনি আলোচ্য সৃষ্টির মুখোমুখি হন। আর সেই সৃষ্টির পাঠসঞ্জাত আনন্দ তথা রসোপভোগের দ্বারা নিজেকে অধিকৃত করে থাকেন। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনার ভঙ্গি 'বিম্বধর্মী' (impressionistic) বা সমালোচকের নিজস্ব উপভোগ নির্ভর বলে মনে হয়। তবে তাঁর অনুশীলিত সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচারক সত্তা প্রচ্ছন্ন থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্মকেই প্রধান করে দেখেন বলে বিভিন্ন চরিত্রের লেখকদের আবিষ্কার করতে, স্বাগত জানাতে ও তাঁদের প্রচারক হতে পেরেছেন। একারণেই জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুধীন্দ্রনাথ, বোদ্‌লেয়ার ও রিলকে প্রমুখ বিপরীতধর্মী কবিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। অর্থাৎ সমালোচনার জন্য তিনি জোর দেন কবি বা সাহিত্যিকের নিজস্ব চরিত্রের ওপর। সে কারণে প্রপাগান্ডিস্ট শিল্পীও তাঁর মূল্যায়ন থেকে বাদ পড়েন না। কিন্তু সে বিচারের কারণ সর্বাগ্রে বিষয়বস্তুগত অর্থাৎ প্রপাগান্ডা নয়, শিল্পের প্রয়োজনে তিনি তা করেছেন। 'দুর্যোগের দিনে শিল্পকলার চাইতে প্রপাগান্ডারই বেশি প্রয়োজন' (বুদ্ধদেব, ২০০৭ : ১৫৯) একথা মানলেও সেটাকে যুগোপযোগী যথার্থ সাহিত্য বলে বিবেচনা করতে নারাজ তিনি। সাময়িকতার প্রয়োজনেই প্রচারকে তাৎক্ষণিক মূল্য দিয়েছেন তিনি। রাজনীতিকে সাহিত্যরচনার অভ্যন্তরীণ তাগিদ হিসেবেও সমান গুরুত্ব দেন বুদ্ধদেব, এটি তাঁর কাছে শিল্প রচনার অন্যান্য প্রেরণার মতোই। তাছাড়া শিল্পের আদর্শে উত্তীর্ণ সাহিত্য 'রাজনৈতিক মতাদর্শ-সম্পন্ন' হলেও ক্ষতি নেই এমনটাই ভাবেন তিনি। কারণ হিসেবে তিনি জানান, শিল্পকলার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে; সুতরাং রচনাটি যথার্থ সাহিত্য হলেই হল। (বুদ্ধদেব, ২০০৭ : ১৫৯) রাজনীতি ও সমাজচেতনাও সমার্থক নয় বুদ্ধদেবের কাছে। সমাজচেতনা একটি বৃহৎ এবং বিস্তৃত চেতনা। রাজনীতি তারই অংশ মাত্র। তবে আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামোর স্তরীভূত বাস্তবতায় রাজনীতি যেমন করে ব্যাখ্যাত হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তৎপ্রসূত শ্রেণিসংগ্রামের সত্যে ও কলোনিয়াল পরিবেশে যে সমস্যাকে প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক করে দেখেছিলেন সমকালীন অনেক সাহিত্যিক; বুদ্ধদেবের কাছে সে সমস্যা ছিল একান্তই নৈতিক। তাঁর সত্তার মাঝে যা কিছু ভালো, কিংবা খাঁটি; সবটাই তিনি সাহিত্যচর্চাতে একান্তভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, কেবল শিল্প-সাহিত্যের মূল্য ও তা রচনার প্রবল আন্ত রিক উৎসাহের মাঝেই তাঁর জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি নিহিত। রাজনীতি, সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের প্রভেদ প্রসঙ্গে তিনি আরো মত প্রকাশ করেছেন 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' (*সাহিত্যচর্চা*) প্রবন্ধে। 'কবিতা' পত্রিকায় রাজনৈতিক আদর্শ মেনে চলা অনেক লেখককে

নানা সময়ের রচনা নিয়ে বুদ্ধদেব অনুযোগ করেছেন যে, রাজনৈতিক দলীয় আবর্তে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা কাব্যপ্রতিভার অপচয় করছেন। অবশ্য ফ্যাসিবাদী হিটলার-মুসোলিনী চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৩৫ সালের পর থেকে পৃথিবীর দেশে-দেশে যখন প্রথমে প্রগতি ও পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হয়, বুদ্ধদেব বসু তখন এই সংঘের ভারতীয় শাখার কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। (উদ্ধৃত, সমীর, ২০০৮ : ১৫২)। উল্লেখ্য যে, সোভিয়েট লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি ম্যাক্সিম গোর্কিই (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রথম প্রচার করেন যে, ফ্যাসিবাদের মতো সর্বগ্রাসী প্রলয়কে রুখতে হলে সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক এবং শিল্পীদেরও একত্র হয়ে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন আছে। তিনি এই আন্দোলনের জীবন্ত প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বরের প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধদেব; এছাড়া ১৯৪২-এ সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে নিহত হলে ওই বছরের মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলনেও যোগ দেন তিনি। (উদ্ধৃত, সমীর, ২০০৮ : ১৫২)। রাজনীতির মৌলধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব; সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিপুল ক্ষতিকর প্রতিফল সম্পর্কেও ভাবিত ছিলেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ বা মতবাদপিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর কর্মী হতে পছন্দ করেননি।[২] নিজস্ব মানবিক আদর্শের তাগিদে প্রগতি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। 'আর শিল্পীমনের অন্তর্বৃত প্রবণতার কারণে' (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৭ : ৯১) তিনি আসলে রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় তাঁর সবচেয়ে বড় চাওয়া — "বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গণবিগ্রহ মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা থেকে বের করে প্রকৃত স্বরূপে দাঁড় করানোই হোক রবীন্দ্রচর্চা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকর্মের সৃষ্টির সমগ্রতার সন্ধানে তাঁর মননশীল পর্যবেক্ষণই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রূপগত বিবর্তন ও শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির প্রতি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন তিনি — যার ফলে সমকালীন ও উত্তরকালীন রবীন্দ্র সমালোচনায় তিনি মেলবন্ধনকারী হয়ে ওঠেন।" (আকতার, ২০১৪ : ৪)

সাহিত্যপাঠ ও চর্চার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ অর্থাৎ এর পরিসর হওয়া উচিত বৃহৎ; আপন দেশীয় সমাজব্যবস্থা কিংবা সংস্কৃতি-ইতিহাস পাঠের মধ্যে সাহিত্যের স্বরূপ অনুসন্ধানের সঙ্গেই প্রয়োজন বিশ্ববোধ ও তুলনামূলক বিচার — এ ধরনের মতাদর্শে বুদ্ধদেব গোড়া থেকেই বিশ্বাসী। তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ ও সার্থকতা নিয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপনের পথ বেছে নিয়ে পঞ্চাশের দশকেই ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্যের মতো একটি ব্যতিক্রমী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যপাঠকে সংকীর্ণমনস্কতা থেকে মুক্তি দেবার পথ প্রদর্শন করেন তিনি। তুলনামূলক বিচার ধারার পদ্ধতিকে কেবল একটা পদ্ধতি হিসেবে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাবনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠার উপায় হিসেবে একে বিচার করেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করতে চেয়েছেন — বুদ্ধদেব বসু সেই ধারাকেই আরো বিস্তৃত এবং গভীরতর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জীবনানন্দ ও ইয়েট্‌সকে তিনিই প্রথম সমধর্মী বলে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু আধার ও আধেয়ের সামঞ্জস্যকে শিল্পের সফলতার শর্ত মনে করলেও তাঁর সাহিত্যবিচারে আঙ্গিকগত বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের বিচারে তাঁর ভাষা ও ফর্মকেন্দ্রিক পর্যালোচনা বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষত রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর ভূমিকা কেবল ঐতিহাসিক নয়, ভাষারীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা অনতিক্রমণীয়।

সমালোচক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি — কোনো বিশেষ রচনা নয়, কোনো বিশেষ লেখককে প্রতিষ্ঠা দেওয়াও নয় : শ্রেষ্ঠ কীর্তি — সাহিত্যের মুল্য সম্পর্কে তাঁর সমাজকে সজাগ করা। সাহিত্য সৃষ্টি করে, সাহিত্যের মূল্যের কথা বলে তিনি সাহিত্যের জন্যই পূর্বাপর সংগ্রাম করে গেছেন। আর সাহিত্য গুণ আবিষ্কারের জন্য সাহিত্যনুরাগ সৃষ্টি করে, এমন সমালোচনা যে আবশ্যক — এই মতের প্রচারকও তিনি। তাই নিজের সাহিত্যরুচির সীমানা অনুধাবন করেও একজন উল্লেখযোগ্য সম্পাদক হিসেবে, একজন নির্দিষ্ট সাহিত্যনুরাগী হিসেবে নব্য সাহিত্যকদের সমালোচনা করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে শনাক্ত করা সমালোচকের একটি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করেছেন তিনি। সমকালের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাহিত্যচর্চায় সমালোচকের এই ধরনের দায়বদ্ধতা ফলপ্রসূ হতে পারে।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসুর আরেক উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর অসামান্য গদ্যশৈলী। ভাষায় সমালোচকের ব্যক্তি প্রতিভা এবং স্বোপার্জিত বৈদগ্ধ্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর শব্দ, তাঁর শৈলী কিংবা ব্যঞ্জনা; শব্দ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রয়েছে নিজস্ব স্বরভঙ্গি। ব্যক্তিত্বের চিহ্নস্মারক হয়ে-ওঠা ভঙ্গি সমালোচনার গদ্যে কতটুকু প্রয়োজন তা সমকালই নির্ধারণ করবে; তবে যে সমালোচকের ব্যবহৃত শব্দের আবেগ, গতি, ব্যঞ্জনা সর্বোপরি শৈলী (style) সাহিত্যচর্চায় পাঠককে আগ্রহী করে তোলে, যোগ্য সাহিত্যকর্ম শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমালোচক-প্রভাবিত পাঠকের ভ্রান্তির সম্ভাবনা সাথে নিয়েও সেই সমালোচনার উপযোগিতা একালেও অটুট রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেবের সমকালীন কবি কিংবা লেখকেরা যখন বাইরের ঘটনাবলি এবং বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিচেতন (অবজেক্‌টিভিটি) শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন, বুদ্ধদেব সে পথে না গিয়ে আত্মসামগ্র্যকে (সাবজেক্‌টিভিটি) শিল্পাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মন্ময়তাও বস্তু নিরপেক্ষ হতে পারে না। তা বস্তুরই ভাবময় রূপ, সমাজ প্রতিবেশেরই উৎসারণ। বুদ্ধদেবের সমালোচনা ভাবনাবলি তাই সমাজ-বিবিক্ত নয়। সমালোচনায় যদিও তিনি পদ্ধতি হিসেবে ঐতিহাসিক সাহিত্য বিচার এককভাবে স্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর রবীন্দ্র অথবা আধুনিক সাহিত্য-বিষয়ক সমালোচনায় দেশকাল সমাজকাঠামো তথা সময়ের অনিবার্য প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তাঁর বিচারভঙ্গি 'ইমপ্রেশনিস্টিক' হয়েও যৌক্তিক। শিল্প সম্পর্কে তাঁর যে দর্শন — সেখান থেকে মূলত সমকালে তাঁর সাথে অন্যের স্বাতন্ত্র্যের সূত্রপাত — আর সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর প্রতিভা ও শ্রমের মিলনে হয়ে উঠেছে ইতিবাচক।

টীকা

১. নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। নরেশ গুহ (১৯২৩-২০০৮) বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী। রিপন কলেজে বুদ্ধদেবের ছাত্র ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবের অবর্তমানে তিনি 'কবিতা'র অনেক সংখ্যা সম্পাদনাও করেছেন। (চিঠির এ অংশটি উদ্ধৃত : অশ্রুকুমার, ১৩৮৬ : ১৯৬)

২. "আমি বলতে চাই যে শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ক'রে সেই মতের নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা — এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন ক'রে তিনি যদি একান্তভাবে একটি মাত্র মতবাদেই দীক্ষা নেন — সে-মতবাদের নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না তাহ'লে তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে।" (বুদ্ধদেব, ২০০৯ : ১৪৪)।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অরুণকুমার সরকার, ১৯৬৮, পুনঃপ্রকাশ ২০০২। 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', *কলকাতা* (সম্পাদক : জ্যোতির্ময় দত্ত), প্রতিভাস, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার, ১৩৮৬। *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

আশা দত্ত, ১৯৯৭। *বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা*, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ২০০৮। 'আত্মতার বন্দীই মূলত', *উত্তরাধিকার* (বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০১০। 'অন্য বুদ্ধদেব', *বুদ্ধদেব বসু/কাল থেকে কালান্তরে* (সম্পাদক বেলা দাস), পুনশ্চ, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৭। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৭৪। *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৭। 'কালের পুতুল', *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০০৫। *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০০৭। *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০০৯। *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০১০। *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য, 'কবিতা' থেকে* (প্রথম খণ্ড/সম্পাদকীয় ও সমালোচনা, সম্পাদক দময়ন্তী বসু সিং), বিকল্প, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১৪। 'ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসুর নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, অবসর, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা।

রাশিদ আসকারী, ২০০২। *উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব*, ফ্রেন্ডস্ বুক কর্নার, ঢাকা।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৮। 'সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু : প্রাক-*কবিতা* পর্ব', *জলার্ক* (সম্পাদক : মানব চক্রবর্তী), উনবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

সুদীপ বসু, ১৯৯৭। *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।